"বন্ধু.....কেমন আছিস বল?"

সুমন বসু
এ. ডি. এস. আর., নন্দীগ্রাম

বুধবার, বেলা ৩তে নাগাদ সামনে একাধিক দলিল নিয়ে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, মোবাইলতা বেতে উঠল, একতু আগেই বাড়িতে ফোন করেছি, তাহলে কি DR. -এর ফোন? "সৌমিত্র চ্যাটার্জী কলিং".....বাল্যবন্ধু, এখন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার।

"হ্যালো?"

"শোন! কি করছিস?"

"ধুর বোকা.....ফালতু গ্যাঁজানোর সময় নেই, অনেক কাজ,"

"কথা আছে। সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী কে মনে আছে.....বি.ডি. স্কুলের.....ও আরও কয়েকজন মিলে একটা গেট্ টুগেদার করছে—অনেকের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করেছে—তোকে কয়েকজনের দায়িত্ব নিতে হবে। ২১শে এপ্রিল ডেট্ করেছে-venue পরে ঠিক করবে।"

আমি অবাক, কম্পিউটার থেকে চোখ সরে গেল, চেয়ার হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলাম সুদীপ্ত-র কথা, মাধ্যমিক দেওয়ার পর গত ২১-২২ বছর ওকে দেখিনি।

"তোর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ হল?" জিজ্ঞাসা করলাম।

" ফেস্বুকে এ্যাকাউন্ট আছে—তুই তো কিছুই জানলি না।"

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো আছিই.....কাদের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করতে পেরেছে?"

"নেপো, লেবু, বিরাতি, তিস্তা, ইন্দ্রানী, ভোঁদড়, পেবো, ডাম্বেল, অর্ণব, কৌশিক সাহা, পাগলা, মৌসুমী...."

নামগুলো শুনতে শুনতে নস্ত্যালত্কি হয়ে পড়ছিলাম, এদের কারও কারও সঙ্গে গত বাইশ বছরে একবার, দুবার বা কোনদিনও দেখা হয়নি। সবাই প্রতিষ্ঠিত, কেউ বা সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সুদীপ্তের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়.....ঠিক আছে, পরে কথা হবে।"

সৌমিত্র.....আমরা একসঙ্গে আঠারো বছর পড়াশুনা করেছি বারো বছর বিধান নগর গভঃ হাইস্কুলে এবং পরবর্ত্তী ছয় বছর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্তার ডিগ্রী পর্যন্ত।

দিন কয়েক পর একতা unknown number থেকে ফোন এল।

"কিরে সুমন, সুদীপ্ত বলছি, সব শুনেছিস তো.....গেট টুগেদার এর ব্যাপারটা।"

গলার আওয়াজ শুনেই চেনা যাচ্ছে সুদীপ্তকে.....যেন স্কুলের ফেলে আসা দিনগুলি।

কি দুষ্টু ছিল, লাফ ঝাঁপ দিত সর্বক্ষণ, টিফিন পিরিয়ডে বেঞ্চগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেত, কিন্তু দিলখোলা ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম " কি করছিস রে এখন?"

বলল "ITC তে আছি।"

তারপর আরও অনেক কথা.....বাইশ বছর পর।

ওরা যোগাযোগ করেছে অনেকের সঙ্গেই.....কত নাম .....সবাই এর মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল, এমনকি মেয়েদের অনেকেও আসবে বলেছে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১শে এপ্রিল, RAতে এ্যাসোসিয়েশনের মিটিং থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রাত ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে হাজির হলাম Bowler's Den -এ (Nicco Park এর পাশে) গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একজন সিগারেট ফুঁকছে।

কাছে গিয়ে অস্ফুট উচ্চারণ করলাম "শুভজ্যোতি না?" ২২ বছর পর.....বন্ধু কেমন আছিস বল?"

জড়িয়ে ধরল শুভজ্যোতি, ভেতরে নিয়ে গেল—একে একে শুভজিত রায়, প্রদীপ্ত, অঙ্কুর, ভাস্কর, চিকু, অরিজিত শান্তনু, দেবাশিস, রাজর্ষি.....বেশিরভাগের সঙ্গেই দেখা হল ২২ বছর পর।

স্ত্রী, পুত্রকে স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, ওদের সঙ্গে বসিয়ে দিয়ে শুরু হল আমাদের হুল্লোড়, ছবি তোলার ধুম, সুর একটাই....."বন্ধু কেমন আছিস বল? কতদিন দেখা হয় নি।"

সুজন মুখার্জী (নীল), ইন্দ্রানী মুখার্জী (জিনিয়া) সিরিয়াল, সিনেমা করে এমন মোটামুটি সেলিব্রেটি। 'লক্ষীছানা'-র সুজন তো এখন নামকরা পরিচালকদের সঙ্গে ভালোভালো কাজ করছে। ঋতব্রত ভট্টাচার্য স্টার জলসার FIR-এর অ্যাঙ্কর মিডিয়ায় নাম করেছে। সকলেই তাদের ব্যস্ত schedule cancel করো কিছু সময়ের মধ্যে চলে এল কিছুক্ষণের মধ্যে। অনেকেই বিদেশে থাকায় আসতে পারে নি। তবে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেছে।

বুঝলাম স্কুলের বন্ধুত্বটা সত্যিই স্বার্থহীন বন্ধুত্ব.....যে যে কাজই করুক না কেন উন্মত্ত আনন্দে, চিৎকারে মেতে উঠলাম আমরা, ২২ বছর পর দেখা হওয়ার আনন্দ, উচ্ছ্বাস। সুর একটাই ".....কতদিন দেখা হয়নি।" স্কুলের কত পুরনো ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

শুভজিত ঘোষণা করল পরের গেট্ টুগেদার নন্দীগ্রামে সুমনের ওখানে হবে। কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, কেউ বা শিহরিত হল। সুজন বলল ওর পরের সিনেমা "তিন ইয়ারি কথা" সকলকে দেখতেই হবে।

আমার ছেলেটা দেখলাম রাজু পালের-ছেলের সঙ্গে "কাগজ মোড়ানো বল" নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। স্ত্রী ও আমার স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল, তারপর খাওয়া দাওয়া শুরু হল।

চোখের নিমেষে কেটে গেল প্রায় ঘন্টা তিনেক। স্ত্রী মনে করিয়ে দিল "দশটা বেজে গেছে।" ঘড়িতে দেখলাম ১০টা-১৫ হয়ে গেছে।

অগত্যা....এবার বিদায় নেওয়ার পালা।

"বন্ধু তাহলে আসি—আবার দেখা হবে।"

একে একে সবাই জড়িয়ে ধরল, আরও কিছু সময় থেকে যেতে বলল।

ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। আরও কিছু সময় থাকলে ভালো হত। কিন্তু পরের দিন সকালে আবার নন্দীগ্রাম যাত্রা, চাকরীর তাগিদে।

প্রায় ঘন্টা তিনেকের সুখ স্মৃতি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম আমরা তিনজন।

তাঁহাদের কথা

সুপুত্র

বাবলা ঘোষ

অবসরপ্রাপ্ত তয়েন্ত কমিশনার অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ, পঃ বঃ

রমেশ বলল, তোমাদের প্রেসিডেন্ত কে?

লোকতি বলল, যে-ই হোক ভাড়া পঁচিশ তাকা, বৃষ্টি হলে পাঁচ তাকা বেশি লাগবে।

রমেশ বলল, এই দু' মাস আগেও তো পনের তাকায় বাবুকে নিয়ে গেছ। আত পঁচিশ, আবার পাঁচ এক্সত্রা, ঠিক বুঝতে পারছি না তো!

—কেন বুঝতে পারছেন না বাবু! দু' মাস আগের বাত্তরদর আর আতকের বাত্তর দর কি এক? চাল, ডাল মাছ, মাংস, পতল, বেগুন, ঝিঙে বাত্তরে তো আগুন, হাত দেবার ত্তে নেই আমাদের ও তো পেতে কিছু দিতে হয় না কি! আর এ বছরে তো বৃষ্টি বাদলার কথা সকলেই তনেন। ভিতে ভিতে আমাদের সবার শরীর খারাপ।

রমেশ মনে মনে ভাবল, লোকতির কথা বার্তা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে। এই মেত্রতে কথা সে আগে কখনোই শোনেনি। রিক্সোভাড়া যা চাইছে, তাও অস্বাভাবিক। কিন্তু তার বাবু অর্থাৎ সুকমল ভট্টাচার্যের কোলকাতায় খুব তরুরি কাত। ভোর চারতের ত্রেন ধরে তাঁকে যেতেই হবে। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, তাহলে কি আর কিছু কমানোর নেই?

—না বাবু, কমানোর কথা একদম বলবেন না। মাসখানিক বাকি পুত্রের। ছেলেপিলের একতা নতুন বস্ত্র কিনতে পারিনি এখনও। চাইলে আমাদের প্রেসিডেন্ত সত্তল রায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।

রমেশ বুঝল, কথা বলে লাভ হবে না। বলল, ঠিক আছে ভোর সাড়ে তিনতেয় রিক্সো লাগাবে কিন্তু। আমি বাবুকে গিয়ে বলছি।

রমেশ ফিরে এসে তার বাবুকে সব কথা বলল। শুনে বাবু শুধু 'হুঁ' শব্দ করলেন। এমনিতেই তিনি আতকাল বেশি কথা বলেন না। বছর দুই আগে সেরিব্রাল অ্যাতাক হওয়ার পর থেকে স্ত্রী সুমনাদেবী শয্যাশায়ী। তানা তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর পক্ষাঘাত নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। চব্বিশ ঘন্তা আয়া রাখতে হয়েছে। ওষুধপথ্যি, ডাক্তার, কোবরেত করে করে তিনি প্রায় নিঃস্ব। নিত্তের সামান্য পেনশনের তাকায় আর চলে না। এম-আই-এস ছিল —তার থেকে কিছু ভাঙিয়ে নিতে হয়েছে। এছাড়া আর কোন পথ ও ছিল না। তিনি কারো কাছে হাত পাততে পারেন না। তাঁর বড় ছেলে ডাক্তার, দিল্লিতে থাকেন। বড় হাসপাতালে কর্মরত। কুড়ি হাত্তর তাকার একতি চেক পাঠিয়ে দায় মুক্ত হতে চেয়েছেন। ছোত ছেলে বড় ইঞ্জিনিয়ার। ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। দশ হাত্তর তাকার একতি চেক পাঠাতেও তাঁর নাকি কষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই আত্মত মায়ের এই দুর্দিনে একবার তাঁকে দেখে যেতেও পারেন নি। তবে দুতনের কেউই, বিশেষ করে তাঁর ডাক্তার পুত্র পেশেন্ত এর কি কি যত্ন আত্তি করা প্রয়োতন সে বিষয়ে বিশদ উপদেশাবলী দূরভাষে তনাতে দ্বিধা বা কার্পণ্য করেননি।

পুত্রদের এহেন কর্তব্যপরায়ণতায় ব্যথিত হয়ে সুকমলবাবু হাইকোর্তের দ্বারস্থ হয়েছেন কয়েকমাস পূর্বে। আগামীকাল সেই মামলার শুনানির দিন। ভোর চারতের ত্রেন না ধরলে বেলা দশতার মধ্যে পৌঁছতে পারবেন না।

ভোর সাড়ে তিনটেয় সুকমলবাবু বাড়ী থেকে বেরোলেন। রিক্সোওয়ালা হাজির। বৃষ্টি নেই। রমেশ ফাইলপত্র সহ বাবুকে রিক্সোয় তুলে দিল। রিক্সো চলতে শুরু করল। যেতে যেতে রিক্সোওয়ালা আপন মনে তার কিছু অভাব অনটনের কথা বলে যেতে লাগল। সুকমলবাবু কোন মন্তব্য করলেন না। কিন্তু তিনি মুগ্ধ হলেন নিজের অসুস্থ বাবার প্রতি তার কর্তব্যপরায়নতার কথা শুনে। রিক্সো থেকে নেমে ভাড়া দিয়ে তিনি স্টেশনে ঢুকলেন। টিকিট কাটলেন লাইন দিয়ে। তারপর সেই পূর্বনির্দিষ্ট ট্রেন ধরেই যথাসময়ে হাইকোর্টে হাজির হলেন।

মামলা প্রায় শেষ পর্যায়ে। আজ দুই পুত্রেরই হাজির হওয়ার কথা। এর আগে দুবার দুজনের কেউই নানা অজুহাতে

কোর্টে হাজির হননি। এবারে তৃতীয় শমন গেছে। হাজির না হলে মাননীয় বিচারপতি কড়া পদক্ষেপ নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। সুকমল বাবুর অ্যাড্‌ভোকেট মিস্টার সেন হাজির। হাজির হয়েছেন বিবাদীপক্ষের অর্থাৎ তাঁর পুত্রদ্বয়ের পক্ষে অ্যাডভোকেট মিস্টার দত্ত। ঘুড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা তখনই উঠে এলেন মাননীয় জাস্টিস্ ব্যানার্জী। সকলে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। বিচারপতি আসন গ্রহণ করলে বিচারের কাজ শুরু হল।

মাননীয় বিচারপতি ফাইলের দু-তিনটি পাতা উল্টেই মিস্টার দত্তের দিকে তাকালেন। মিস্টার দত্ত দাঁড়িয়ে বললেন, মি লর্ড, আমার দুই মক্কেলের মধ্যে একজন অর্থাৎ কনিষ্ঠ পুত্র উজ্জ্বল ভট্টাচার্য হাজির। আর একজন একটি বিশেষ কাজে বিদেশে রয়েছেন বলে আজ আসতে পারেননি। আপনি দয়া করে একটি ডেট দিলেই তিনি হাজির হবেন।

বিচারপতি বললেন, মিস্টার দত্ত, তার আর প্রয়োজন কি? ওয়ারান্ট ইস্যু করছি। এবরে পুলিশের দায়িত্ব তাঁকে হাজির করানোর। মাননীয় বিচারপতির নির্দেশে উজ্জ্বলবাবুকে কাঠগড়ায় তোলা হল এবং সত্যপাঠ করানো হল।

বিচারপতির অনুমতি নিয়ে অ্যাড্‌ভোকেট সেন প্রশ্ন করতে লাগলেন—

আপনার নাম?

—উজ্জ্বল ভট্টাচার্য।

—বয়স?

—বিয়াল্লিশ বছর।

—কোথায় থাকেন?

—ব্যাঙ্গালোরে।

—পেশায় কি আপনি?

—ইঞ্জীনীয়ার।

—সুন্দর। আপনার বাবার বয়স কত বলতে পারেন?

—প্রায় পঁচাত্তর বছর।

—আর মায়ের?

—সত্তর এর কাছাকাছি হবে।

—ভেরি গুড্। একটা কথা বলুন তো।

আপনার চাকুরী কতদিন হল?

—বছর ষোল হবে।

—আপনি বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

—সন্তান কয়টি?

—এক পুত্র।

—স্ত্রী হাউস ওয়াইফ্ না চাকুরিরতা?

—চাকুরিরতা।

—ওঃ। তাহলে তো পরিবারে উপার্জন ভালই।

ব্যাঙ্ক ব্যালান্স্ মন্দ নয়।

—উজ্জ্বলবাবু নিরুত্তর।

—ঠিক আছে। মৌনম সম্মতি লক্ষ্মনম্ বটে!

আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, আপনার বাবার মাসিক আয় কত?

—ঠিক জানিনা।

—অপূর্ব। জানার চেষ্টাও করেননি কোনদিন?

—কোন উত্তর নেই।

—আপনার মা-বাবা নিজেরা অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে খুব কষ্ট করে আপনাদের দুই ভাইকে মানুষ, ওঃ সরি লেখাপড়া শিখিয়ে চাকুরি পাওয়ার যোগ্য করেছেন, তাইতো?

—নিশ্চয়ই করেছেন।

—কতদিন পর পর মা-বাবাকে দেখতে আসেন?

—মাঝে মাঝে।

—শেষ কবে এসেছিলেন?

—বছর তিনেক হবে।

—অপূর্ব পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি! মা কতদিন অসুস্থ?

—বছর দুই হবে।

—তার মানে অসুস্থ মাকে একটিবার ও দেখতে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি।

—মানে, আসব আসব করছিলাম.....

—বুঝেছি, বুঝেছি। মায়ের এই সিরিয়াস ইল্‌নেস্ এর জন্য দু'বছর ধরে আসব আসব করেও কাজের চাপে আসতে পারেননি।

—একজাক্টলি।

—আর এই শমন পেয়ে, তাও তৃতীয় শমন, আপনি ছুটে এসেছেন মাকে দেখবেন বলে? আহা! সুপুত্র আর কারে কয়!

আচ্ছা আপনার শ্বশুরমশাই কোথায় থাকেন?

—মুম্বাইতে।

—কতদিন আগে তাঁদের বাড়ী গেছেন?

—মাস তিনেক আগে।

—তিনি খুব অসুস্থ নাকি?

—না, তা নয়।

মাননীয় বিচারপতির দিকে তাকিয়ে মিষ্টার সেন বললেন, মি লর্ড, এই উজ্জ্বলবাবু মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। দু বছর ধরে শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও মা কে একবার দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু শ্বশুরমশাইর বাড়ীতে রুটিন ভিজিট করতে ভুল হয়নি। দি পয়েন্ট মে কাইন্ডলি বি নোটেড্ মি লর্ড।

আই স্ট্রংলি অবজেক্ট মাই লর্ড—বললেন মিস্টার দত্ত। মিস্টার সেন আমার ক্লায়েন্টকে ইনসাল্ট করছেন। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে।

অবজেক্‌শন্ ওভার রুল্‌ড্—বললেন বিচারপতি। মিস্টার সেন ইউ মে প্রোসীড।

—থ্যাঙ্ক ইউ মাই লর্ড—বললেন মিস্টার সেন।

আচ্ছা মিস্টার ভট্টাচার্য, আপনার মায়ের চিকিৎসার জন্য কিরকম খরচ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

—ঠিক ধারনা নেই।

—বাবার সঙ্গে তো ফোনে কথা হয়ে থাকবে?

—তা হয়েছে।

—কোন হিন্ট্‌স্ দিয়েছিলেন তিনি?

—হ্যাঁ। বাবা বলেছিলেন২/৩ লাখ টাকার প্রয়োজন।

—সুন্দর! আর আপনি পাঠালেন একটি দশ হাজার টাকার চেক! আর এতদিনে মা বাঁচলেন না মরলেন, তার কোন খোঁজ খবরই রাখলেন না। অপূর্ব!

—এই আজই বাবার সঙ্গে কথা বলব।

—কিন্তু আপনার বাবা তো বারবার বলেছেন টাকা পাঠানোর জন্য। আপনারা একটু তৎপর হলে তিনি অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে কি কোর্টে আসতেন? মিস্টার ভট্টাচার্য, আপনার কি কোন ধারণা আছে একজন পিতা ঠিক কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁর আত্মজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন?

তারপর বিচারপতির দিকে ঘুরে বললেন—দিস্ পয়েন্ট মে কাইন্ডলি বি নোটেড অল্‌সো, মাই লর্ড।

মাননীয় বিচারপতি আজকের মত শুনানি মুলতুবি রাখলেন। দুই সপ্তাহ বাদে পরবর্তী দিন ঘোষনা করলেন।

ওয়ারান্ট ইস্যু করা হল সেদিন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হাজির করার জন্য। সকলে বেরিয়ে পড়লেন। সুকমলবাবু বেরিয়ে তাঁর অ্যাড্‌ভোকেটের সঙ্গে কিছু কথা বলে ছুটলেন শিয়ালদা স্টেশনে। বাড়ী পৌঁছলেন প্রায় রাত আটটায়।

কিন্তু বাড়ীতে যে কিন্তু দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল তা সুকমলবাবু ভাবতে পারেন নি। সেদিন বিকেলেই তাঁর স্ত্রী অবস্থা এমন সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওটে যে রমেশ বাধ্য হয় প্রতিবেশীদের ডেকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে।

সুকমলবাবু ছুটলেন হাসপাতালে।

পেশেন্ট তাই সি ইউতে। স্যালাইন্ চলছে। ডাক্তারবাবু রাউন্ডে আছেন। ফিরলে কথা হবে। সুকমলবাবু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এলেন। কিন্তু কথা বলছেন না দেখে সুকমলবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন আরও।

জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারবাবু বললেন, পেশেন্ট এর অবস্থা শোচনীয়। একটা অপারেশন এর আশু প্রয়োজন। অপারেশনটা রিস্কিও বটে। তবু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। মনস্থির করে নিন। আর এই অপারেশন এখানে হবে না—পরিকাঠামোর অভাব। কোলকাতায় করাতে হবে। কমপক্ষে লাখ দুই টাকার প্রয়োজন হতে পারে! তৈরী থাকুন। কাল সকালেই পেশেন্টকে শিফ্‌ট্ করাতে হবে।

সুকমলবাবু কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পাশের চেয়ার ধপাস করে বসে পড়লেন। এমন সময় কে যেন তাঁর পিঠে হাত রাখলেন। তাকিয়ে দেখেন তাঁর ছোট ছেলে উজ্জ্বল। ইঙ্গিতে বোঝালেন, আমি আছি, চিন্তা করবেন না।

উজ্জ্বলবাবু এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বললেন, মায়ের জন্য যা যা করণীয় সব করুন, দেরি করবেন না দয়া করে। টাকা পয়সার কোন অসুবিধা হবে না।

ডাক্তারবাবু খুব যত্নের সঙ্গে পেশেন্টকে শিফ্‌টের ব্যবস্থা করলেন। পরদিন সকাল ন'টায় ধীরে ধীরে অ্যাম্বুলান্স চলতে শুরু করল। একজন ডাক্তার ও নার্স ছাড়া পেশেন্ট এর সঙ্গী হলেন তাঁরা পিতা-পুত্র।

বিকেল তিনটে নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছলেন। অ্যাডমিশন হল। সর্বত্র উজ্জ্বলবাবুই এগিয়ে যাচ্ছেন, কথা বলছেন। একটি হোটেল বাবাকে তুলে দিয়ে বললেন, চিন্তা করবেন না! আমি আছি। এখন কলকাতায় অনেক নামী দামী হাসপাতাল। এটিও একটি বড় হাসপাতাল। নিজেদের ল্যাবরেটরিতে সমস্ত রকম প্যাথলজিকাল টেস্ট্ চলতে লাগল। পুত্রকে কাছে পেয়ে সুকমলবাবু বুকে বল পেয়েছেন। পরদিন সকালে বড় ছেলে ডাঃ পবিত্র ভট্টাচার্য এসে হাজির হলে আরও সাহস বাড়ল তাঁর। বেশ অবাকও হলেন। বুঝতে অসুবিধে হল না যে এসবই ছোট ছেলের কীর্তি। পবিত্রবাবু বাবার পায়ের ধুলো ও কুশলাদি নিয়েই সোজা চলে গেলেন হাসপাতালে। নিজের পরিচয় দিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। জরুরি অপারেশন এর ব্যবস্থা করা হল। দীর্ঘক্ষণ পর ও.টি. থেকে বেরিয়ে ডাক্তার বললেন, অপারেশন আপাতত সাকশেসফুল, তবে বাহাত্তর ঘন্টা না পেরোলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

বাহাত্তর ঘন্টা ভালোয় ভালোয় পেরোল। দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিতা পেশেন্ট এর সামনে হাজির হলেন।

পেশেন্ট একবার চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে ফেললেন। তারপর দুই চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। সুকমলবাবু এগিয়ে গেলেন। বললেন, সুমনা দেখ কারা এসেছে—তোমার দুই পুত্র। তারাইতো তোমার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছে, তাইতো তোমাকে বাঁচাতে পারলাম। নইলে এ যাত্রায় আমি তোমাকে বাঁচাতে পারতাম না।

ধীরে ধীরে সুমনা দেবী চোখ খুললেন। দুই ছেলে এগিয়ে গিয়ে মায়ের দুচোখ এর জল মুছে দিলেন। বললেন, মা ক্ষমা করে দাও আমাদের সব অপরাধ। এখন থেকে তোমার ও বাবার কোন অসুবিধা হতে দেব না, তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। মা দুই পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন। পরদিনই দুই পুত্রসহ পিতা হাইকোর্টে হাজির হয়ে অ্যাড্‌ভোকেট মিস্টার সেন ও মিস্টার দত্তকে সব বললেন। মামলা তুলে নেবার আবেদন করা হল। আদালতে মেনশন করা হলে সব শুনে বিচারপতি বললেন, এই তো সুপুত্রের কাজ। মে গড্ ব্লেশ্ ইউ।

যথাসময়ে সুমনাদেবীকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। দুদিন বাদে দুই পুত্রবধূ ও নাতি, নাতনী হাজির হল। দেরীতে হলেও সুকমলবাবু ও সুমনাদেবী সুখের মুখ দেখতে পেলেন। বেটার লেট দ্যান নেভার—আপ্তবাক্যটি তাঁদের মনে পড়ল।

হেঁই গোলাপী.....

অভিতিৎ আচার্য্য ভাদুড়ী

এ. ডি. এস. আর., ময়নাগুড়ি

আড়ে আড়ে তুই তাকাস্ ক্যানে,

বলতে কি চাস্ তুই?

ওই আগুন চোখের ঝলকানিতে

তুইলবো লাকি মুই?

চৈত গাত্নের মেলাতে, লরম চোইখের ইশারাতে

মনের মাঝে উঠ্যায়েছিলি কালবোশেখের ঝড়;

আত বিহানে মহুলবনে, ঝুমুর লাচের সাত-পরণে

ভাইলেছিলি আমার পানে আশমানী কবুতর!

তুনরাইতে বাইত্বে যখন ধামসা-মাদল-কাঁড়া

মোর আঙর-তুলা বুকের মাঝে হরকা ঝোরার পারা—

পিরীতের কইলসি ভইরে, সরাই সকল শরম-ডরে,

ঝাঁপাই পইড়্যে বইলবি কি তুই ভালোবাসিস মোরে?

পলাশ বনে আগুন লাইগে, মাতন মহুয়ায়—

মনতো আমার ধ্যাসকে গেইছে তুয়ার লাতুক ইশারায়।

হেঁই গোলাপী, আয় না কেনে এই ভরা ফাগুনে

তেড় বেঁইধে আইত লাচব ঝুমুর, মোর ঘরের আঙ্গনে।

শব্দার্থ ঃ

তুনরাইতে = জ্যোৎস্নারাতে

আঙর = আগুনে পোড়া কাঠ

ধ্যাসকে = ভিত নড়ে যাওয়া, ভেঙে পড়া

আঙ্গনে = আঙিনায়

"মুখ-আন্ধারি"

নির্মল চন্দ্র বর্মন

এ. ডি. এস. আর., ইতাহার

ফুড়ুৎ করি উড়ি গেইল পখী কোনা
নিঝুম—নিরালাৎ
বেলা শ্যাষের সোনারৌদ
গচের মাতার উপরাৎ
হারে গেইল।
গোরু-ভৈষের দল ঘুংরা বাত্তেয়া
একে একে বাড়িৎ ফিরিল।
এই রাত্তিকোনার বাদে।
চাইদ্দিক থাকি ভাসি আসিল
সৈন্ধ্যা দিবার ত্তেগার
তিনকালিয়া ঠাকুমা
উপ্কতার তোপলা নিয়া বসিল
তিন বচ্চরের নাতির আগোৎ।

কাকোৎ দোত্রা নিয়া বিরাইল
বাউদিয়া
বাঁশী নিয়া স্যাও স্যাও করি পাচোৎ বিরাইল
বাঁশীয়াল
খুতা ধনীর ডারী ঘরোৎ বসিল
তাসের আড্ডা
দিন - দুকাতি মাইয়ালা
ধানচাইল ঘাতির বসিল.....

মুই তকন নেকির বসিনু
ইমাকে নিয়া।

শব্দার্থ ঃ
মুখ-আন্ধারি = গোধুলির ঠিক পরের; সন্ধ্যারম্ভ।
কোনো = টি, টা,
গচের = গাছের,
উপরাৎ = উপরে,
ভৈষ = মোষ,
ঘুংরা = ঘুঙুর,
বাদে = জন্যে,
সৈন্ধ্যা = সন্ধ্যা,
জোগার = উলুধ্বনি,
উপকতা = উপকথা/রূপকথা,
টোপলা = ঝুলি,
আগোৎ = সামনে,
কাকোৎ = বগলে,
বাউদিয়া = ইংরেজ ভ্যাগাব্যাণ্ড।
স্যাও স্যাও = লুকিয়ে, চুপিসারে,
ডারী ঘর = বহির্বাটীতে অতিথি থাকার ঘর,
দিন —দুকাতি মাইয়ালা = অভাগা মহিলারা,
ধান চাইল ঘাটা = অপরের নিন্দা করা,
পরচর্চা, মুই = আমি,
তকন = তখন,
ইমাকে = এদের,
নেকির = লিখতে।

অচেনা জীবন

দেবত্তিৎ রায়
এ. ডি. এস. আর., শ্যামপুর

আমার পিছনে আমি,
সেই শৈশব কাল।
আত বেশ কিছু বৈশাখ শেষে।
দুই হাত মিলিয়ে দেখি—
হাত দুতি মেলেনি এক সাথে।

সময় ছুতে চলেছে এক মেয়ে—
বুড়ি ছুঁয়ে এ জীবন,
একাকী সবাই হয়ত এভাবে—
পড়ন্ত বিকেলের নিঝুম ঝুড়ি নামা বত।
নিথর দাঁড়িয়ে এখনও সেইভাবে অবিকল।

আয়নায় সবাই মুখ দেখে,
কেউ কেউ থাকে অচেনা আবছায়া—
মুখোশ আর মুখ মাখামাখি একসাথে,
কেউ পাশে থাকে কেউ চলে যায় পশ্চাতে।
আর কেউ কেউ থেকে যায় অবিচল।

ছোত ছোত মানুষ দেবতা—
যারা এখনও ছড়িয়ে ছিতিয়ে এখানে ওখানে,
মাঝে মাঝে এসে হাত বাড়ায়—
তেনে নেয় একান্ত নিভৃতে।
সেখানেই আমার ভাল থাকা,
পাশাপাশি পথচলা নিত্তের অতন্তে।।

বনকুমারীর সাথে একটি রাত

সুদর্শন ব্রহ্মচারী

ডি. এস. আর., হুগলী

সূর্য যখন রঙের ঢেউ খেলিয়ে সাতশো পাহাড়ের দেশ মেঘাতুবুরুর দিগন্তে নেমে এল, আমরা তখন কিরিবুরু থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙা পথ ধরে নামতে নামতে অবশেষে খনিত ধোয়া লাল স্রোত পেরিয়ে বড় বড় গাছের ছায়ান্ধকারে ঢুকে পড়লাম। এতাই মেঘাতুবুরুর পাদদেশের জঙ্গল। হাত্তরো পাখির কিচিরমিচির ছাড়া কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ এ বনভূমির কোনও দিকেই বেশীদূর দৃষ্টি যাবার ত্রে নেই। গাছগাছালিতে ঠাসা গভীর বনভূমির দীর্ঘ ও ঋতু গাছের ভীড় ঠেলে ঠেলে কোনরকমে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে দেখতে পেলাম লণ্ঠনের আলো জ্বলছে তিমতিম করে। কাছাকাছি এসে ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী থেমে গেল। মেঘাতুবুরুর জঙ্গলের দিক দিয়ে থলকোবাদে যাবার পথে এতাই প্রথম চেকপোষ্ট ।

দাকার গন্ধে ভরপুর চারিদিক। চারিদকেই চাপ চাপ অন্ধকার। পূব দিকে লম্বা লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে বেপরোয়া চাঁদ উঁকি মারছে। শরতের হিম মোলায়েম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাবে মালুম হচ্ছে। পারমিত দেখিয়ে গেতম্যানের হাতে দশ তাকা গুঁতে দিয়ে ড্রাইভার গাড়ী স্তার্ত দিল। আমরা এগুতে লাগলাম। চার পাঁচ মাইল দূরে দ্বিতীয় চেক পোষ্ট। থলকোবাদের কোর এরিয়া। তারপর চার পাঁচ মাইল গেলেই থলকোবাদের বনবাংলো। সেখান থেকে তিরিলপোশির রাস্তা ধরে কিছু দূর গেলেই ওয়াচ তাওয়ার—আমাদের গন্তব্য। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে তন্তু দেখার মতলব। আমরা যাচ্ছি কিরিবুরু হয়ে। কাল থেকে বনবাংলোতে খুঁতি গেড়েছে পার্থদা আর শিখাদি। ওরা দিনের বেলা তাওয়ারে যাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সেই ভরসাতেই আমরা যাচ্ছি।

একাদশী চাঁদের গায়ে দেখতে দেখতে রূপোলী রঙ ধরেছে। বনপথ লাল মাতির হলেও এখন কালোই। এদিক ওদিক থেকে অনেক সরু পথ এসে মিশেছে আমাদের রাস্তায়। কোন্‌তা যে আসল পথ কেউ ত্রানে না। জঙ্গল ক্রমশ ঘন হতে শুরু করেছে। ছোতখাতো তিলার ওপর ঝোপঝাড়ও এগিয়ে আসতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে চারিদিকে গাছগাছালির ছায়া গাঢ় থেকে আরও গাঢ় হল; নিরেত অন্ধকার গ্রাস করল সবকিছুকেই। কারও মুখে কোন কথা নেই। যতই জঙ্গলের গভীরে ঢুকতে লাগলাম্‌ ততই একতা বুনো গন্ধ অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গা ছম ছম ভাবতাও তাঁকিয়ে বসল। প্রথম চেকপোষ্ট থেকে আত দশ মাইল এসে কয়েকতা এদিক ওদিন তার্ন নেবার পর সর্দারত্তী গাড়ী থামিয়ে তর্চ হাতে নেমে পড়ল। কী যেন খুঁত্তছে। আমরা বুঝতে না পেরে নেমে পড়লাম। তার পাগলামির পরিচয় পেলাম খানিকবাদে। একতা তিলার উপর উঠে গিয়ে তর্চের আলোয় রাস্তা খুঁত্তছে। দ্বিতীয় চেকপোস্তের রাস্তাতা কোন দিকে ঠাহর করতে পারছে না। পথ হারিয়েছি ভাবতেই গা শিউরে উঠল। তবু কীসের যেন আকর্ষণ অনুভব করলাম। সর্দারত্তীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদিক ওদিক হাঁততে লাগলাম। বাঁদিকে এগিয়ে দেখি একতা তিলায় কোন গাছপালা নেই। একেবারে ন্যাড়া। অনেকতা ফাঁকা ভূমি। শুধু কয়েক বিঘা তুড়ে শুধুই ঘাস। এই সন্ধ্যায় শিশির পড়ে পড়ে ভিত্তিয়ে দিয়েছে। তার ওপর এত আলো ! যেন ত্যোৎস্না স্রোতে রূপোর ঢল নেমেছে। আর দূরে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বনভূমি। শুধু 'চোখ গেল !.....চোখ গেল !' সবকিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভয়ভীতি আশংকা সব মুহূর্তে উবে গেল। বনকুমারী তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আমাকে গ্রাস করল। আমি কয়েক মুহূর্তে পরিচিত পৃথিবীর বাইরে পৌঁছে গেলাম। অবর্ণনীয় সেই অনুভব। কাঁধে কার যেন হাত পড়ল। সর্দারত্তী বলল, 'এখানে আর না। হাতী থাকতে পারে'। মুচকি হেসে বলল,'সোত্তপথেই চলি। দেখা যাক'।

খানিকবাদেই দ্বিতীয় চেক পোষ্টে পৌঁছে গেলাম। পারমিত দেখিয়ে বনবাংলোর পথ চিনে এগোতে লাগলাম। এবার কোর এরিয়া। রাস্তা উঁচু নীচু। ঘন জঙ্গলে চাঁদের আলো হারিয়ে গেছে। গাড়ীর আলোয় যততুকু দেখা যায়, তাই সই। রাস্তার শুকনো ভেত্র পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। হঠাৎ গাড়ী ব্রেক কষে ড্রাইভার কাঁচ তুলে দিয়ে বলল, 'সামনেই শ্বাপদ, কিছু একতা দৌড়ে গেল'। আবছায়ায় দেখা গেল, কে যেন দৌড়ে গেল। তারপর, পরপর বেশ কয়েকতা। পাঁচতা ছতা হবে। কিন্তু কে গেল ? কেন দৌড়ে গেল ? বুঝলাম না। হতচকিত। গভীর ভাবে আপ্লুত। সর্দারত্তী বলল, 'বাঘ বা চিতা কিছু তো আছেই। নইলে, তন্তুগুলো এভাবে দৌড়ে পালায় না'। প্রায় মিনিত পাঁচেক এভাবে কাতিয়ে আমরা সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। আমরা মনে মনে আশা করলাম, কোন চিতা বা ভল্লুক গাছ বেয়ে নেমে আসবে। অথবা যদি একদল হাতী রাস্তা পেরিয়ে যায় ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে। একতা উদ্দীপনায় পেয়ে বসল। কিন্তু একতা দেখতেই হবে, নইলে চলবে না। রাস্তার দিকে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে পৌঁছে গেলাম থলকোবাদ।